নাওয়াকীদুল ইসলাম বা ইসলাম (ঈমান) ভঙ্গকারী বা বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ



আরবী ‘নাক্বিদ’ বা ‘ধ্বংসকারী’ শব্দ ‘সুদৃঢ় করণের’ বিপরীত। নাক্বদ অর্থ: উন্মুক্ত করা। যেমন- আরবীতে বলা হয় ‘নাক্বাদাশ শাই’ অর্থাৎ কোন গিট বা কিছুকে সুদৃঢ় করার পর খুলে দেওয়া। আর এটা অর্থগত ও অনুভবগতভাবে হয়ে থাকে।

অনুভবগত: যেমন দড়ি বা বেনি ভাঙ্গা।
অর্থগত: যেমন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, অযু ভঙ্গ করা। আর তা হয় যখন কোন মানুষ কোন কাজ করে, যা করতে তাকে নির্দেশ দেওয়া ও বাধ্য করা হয়েছে যেমন- চুক্তি, বন্ধন। পরবর্তীতে যখন সে এর মূলের বিপরীত কাজ করে তখন সে তা ভেঙ্গে ফেলে। আর মানুষ যখন তাওহীদের বাণীকে স্বীকৃতি দেয় তখন তা অঙ্গীকার ও চুক্তির মতো বাস্তবায়ন ও তার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করা বোঝায়। কিন্তু যখন তার (কালেমার) মৌলিকতার বিপরীত কিছু করে তখন তাকে ভেঙ্গে ফেলে।

ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় অনেক; যেগুলোকে আলেমগণ ফিকহের গ্রন্থে ধর্মত্যাগ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। তবে এই দশটিই মূলত বেশি সংঘটিত হয়।

১। আল্লাহর ইবাদতে কোন কিছুকে শরীক করা: আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।” [সূরা-আন নিসা: ৪৮] যেমন; মৃত ব্যক্তির নিকট দু’আ, প্রার্থনা, ফরিয়াদ এবং মৃত ব্যক্তির নামে মানত ও জবেহ করা, মাজারে সিজদাহ দেওয়া, নিয়্যত বা সংকল্পে শিরক, ভালোবাসায় শিরক, কুরআন এবং সুন্নাহর বিপরীত তথাকথিত পীর আউলিয়া, আমীরের আনুগত্য ইত্যাদি।

গাইরুল্লাহকে আহবান করা এমন বিষয়ে যার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর নিকট রয়েছে; অথবা মৃতদের, মূর্তিদের, গাছ ও অনুরূপ ব্যক্তি বা বস্তুকে আহব্বান করা অথবা অদৃশ্য কাউকে আহব্বান করা। দোয়া একটি ইবাদত যে তা গাইরুল্লাহর জন্য নিবেদন করবে সে শিরক করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য, সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে আহবান করোনা"। [সূরা জ্বীন: ১৮]

যে ব্যক্তি তার ইবাদত দ্বারা দুনিয়া অথবা সম্পদ কিংবা বাসস্থান অথবা প্রশংসা ও অনুরূপ কিছু ইচ্ছা করে এবং ওই ইবাদতের দ্বারা আল্লাহর নির্দেশ পালন ও তার সন্তুষ্টি কামনা করে না, সে এই প্রকার শিরকের মধ্যে পতিত হবে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) বলেন, "আর ইচ্ছা ও সংকল্পের শিরকটি এমন সাগরের মত যার কোন তীর নেই এবং অল্প লোকই সেখান থেকে মুক্তি পায়"। [আল জাওয়াবুল কাফিলিমান সাআলা আনিন দাওয়া ইশশাফি, পৃষ্ঠা: ১৩৫] যে সকল কাজ ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত নয়, তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যেমন: কোন ব্যক্তির সম্পদ বা অন্য কিছুর প্রাপ্তির আশায় কোন বৈধ কাজ করল।

আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি গলায় একটি ক্রুশ ঝুলন্ত অবস্থায় রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট এলে তিনি বললেন, হে আদী এই মূর্তিটি তুমি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। ফলে আমি তা খুলে ফেললাম, অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকটে এসে দেখতে পেলাম, তিনি সূরা তাওবা: ৩১ তিলাওয়াত করছেন: **"তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও পীর আউলিয়াদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে"**। আমি বললাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করতো আর তোমরাও তাকে হালাল ভাবতে। আমি বললাম, হ্যাঁ এমনটিই। তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত। [তিরমিযী: ৩০৯৫ (ইফা), তারিখুল কাবীর লিল ইমাম বুখারী: ৭ম খন্ড, হা: ৪৭১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: ২০৩৫০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মানুষের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে যে আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তার সমকক্ষ মনে করে, তারা তাদের তেমনি ভালোবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহ তা'আলাকেই ভালোবাসা উচিত।" [সূরা বাকারা ২: ১৬৫] ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (রহ) বলেন, এই সকল মুশরিকরা তাদের মূর্তি প্রতিমা ও ইলাহদের ভালবাসে আল্লাহকে ভালবাসার মতো। এধরনের ভালবাসা বন্ধুত্ব ও অবিভাবকত্বের ভালবাসা, আশা, ইবাদত, দোয়া এগুলো যার অনুগামী হয়। এধরনের ভালবাসা নিশ্চিত শিরক যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না। আত্মার খোরাক হিসেবে আল্লাহ নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, চতুষ্পদ প্রাণী, ফসল প্রভৃতির মধ্য হতে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি প্রবৃত্তির পক্ষ হতে ভালবাসা। যেমন; খাবারের প্রতি ক্ষুধার্তদের এবং পানির প্রতি পিপাসার্তদের ভালবাসা; যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি কেউ সেগুলো আল্লাহকে পাওয়ার মতো মাধ্যম হিসেবে ভালবাসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আনুগত্য কামনা করে তাহলে তা যথার্থ হবে। আর তা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ভালবাসার অন্তর্ভূক্ত। এবং তার দ্বারা সে স্বাদ উপভোগ করবে। আর এ অবস্থাটি সৃষ্টির পূর্ণতা। যেটাকে তার নিকট প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে দুনিয়া থেকে নারী ও পবিত্র জিনিসকে। আর এ দুই জিনিসের ভালবাসা তার জন্য সহায়ক হয় আল্লাহর ভালবাসা তাঁর রিসালাত পৌঁছানো এবং তার নির্দেশ বাস্তবায়নে। আর যদি কেউ সেগুলোকে নিজ প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার অনুসরণে ভালবাসে আর সেগুলো যদি

আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টির কারণে প্রভাবিত না হয় বরং নিজ প্রবৃত্তির দিকে ঝুকেঁ পড়ে তাহলে এই ভালবাসাটা হবে অবৈধ ভালবাসা। এর জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কিন্তু আল্লাহর মহব্বতের পূর্ণতায় ঘাটতি হবে। আর যদি সেগুলো তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় এবং সেগুলো প্রাপ্তির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায় এবং সেগুলোকে আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টির ওপর অগ্রাধিকার দেয় তাহলে সে তার আত্মার ওপর জুলুম করল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। [আর রূহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৫৪]

২। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর মাঝে অন্যদেরকে (তাদের মূর্তি, পীর, আউলিয়া, বুজুর্গদের) মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে ও তাদের কাছে প্রার্থনা জানায়, তাদের নিকট সুপারিশ কামনা করে এবং তাদের উপর ভরসা করে, সে আহলুস সুন্নাহর সকল ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে কাফেরঃ যারা একদিন লাত-উজ্জা প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা করতো, তারা কিন্তু এ বিশ্বাস করতো না যে এগুলো হল তাদের প্রভূ বা সৃষ্টিকর্তা। বরং তারা বিশ্বাস করতো এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে বা তাদেরকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করে তারা আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করবে। তারা এটাও বিশ্বাস করতো না যে, এ সকল দেব-দেবী বৃষ্টি দান করে বা রিযক দান করে। তারা বলতো: আমরা তো তাদের ইবাদত করি এ জন্য যে তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। [সূরা যুমার ৩৯: ৩] তারা এ সম্পর্কে আরো বলতো: এরা (দেব-দেবী) আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে শুপারিশ করবে। [সূরা ইউনূস ১০: ১৮] অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে কে আছে এমন (শক্তিমান) ব্যক্তি? [সূরা বাকারা ২: ২৫৫] "আর আল্লাহ মর্জী করেন যার সম্বন্ধে সেই ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো জন্য তাঁরা সুপারিশ করবেনা।" [সূরা আম্বিয়া ২১: ২৮]

যারা আল্লাহ এবং তাদের কার্যের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করছে, তাদের জানা উচিৎ, কাফেরগণের মধ্যে কতক তো প্রতিমা পূজা করে, আবার কতক ঐসব আওলিয়াদের আহ্বান করে যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেনঃ "যাদেরকে তারা আহ্বান করে থাকে তারা তো নিজেরাই তাঁর নৈকট্য লাভের অবলম্বন খুঁজে বেড়ায় যে, তাদের মধ্যে কে নিকটতর। এবং তারা সকলে তাঁর রহমত লাভের আকাঙ্খা করে থাকে এবং তাঁর শাস্তির ভয় করে চলে, নিশ্চয় তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ।" [সূরা বনী ইসরাইল ১৭: ৫৭]

"যখন অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তখন তিনি বলতেন: হে আল্লাহ! আমরা আপনার নবী (ﷺ) এর মাধ্যমে (অসীলায়) আপনার কাছে দুআ করতাম, আপনি আমাদের বৃষ্টি দিতেন। আর এখন আমরা আপনার কাছে আপনার নবীর চাচার অসীলায় (দুআ করছি) আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন। লোকজন বলল, তখন বৃষ্টি হত। [সহীহ বুখারীঃ ৯৫৫ (ইফা)]

কাউকে এ কথা বলা যে, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন, এর অর্থ হল, দুআর ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে অসীলা বা মাধ্যম করা। এটা জায়েয। যেমন সাহাবায়ে কেরাম (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় তাকে অসীলা করে দুআ করেছেন। যার অসীলা দিয়ে দুআ করা হবে, তার জীবিত হওয়া ও উপস্থিত থাকা শর্ত। যেমন আমরা দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জীবিত থাকাকালে তাঁর অসীলা দিয়ে দুআ করা হল। তিনি যখন চলে গেলেন, তখন তাঁরই জীবিত এক মুরুব্বী বয়োবৃদ্ধ আব্বাস (রা) এর অসীলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দুআ করা হল,

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে অসীলা করা হল না। আর ইমাম বুখারী (রহ) এই হাদিসের পরিচ্ছেদের নামই দিয়েছেন, “অনাবৃষ্টির সময় লোকদের ইমামের নিকট বৃষ্টির জন্য দু’আর আবেদন।

“আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, তোমরা তাঁকে সে নামে ডাকো”। [সূরা আল-আ‘রাফঃ ১৮০] আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাঁর কোনো নাম বা গুণের উসীলায় প্রার্থনা করা বৈধ। আরও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা‘আলার কোনো নাম বা তাঁর গুণের উসীলায় তাঁর নিকট প্রার্থনা করা আল্লাহ তা‘আলা অনেক পছন্দ করেন।

প্রার্থনাকারী তার কোনো নেক আমলের উসীলায় প্রার্থনা করা। যেমন, কেউ বলতে পারে, হে আল্লাহ! আপনার প্রতি আমার ঈমান ও বিশ্বাস, ভালোবাসা ও মহব্বত এবং আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের উসীলায় আমার পেরেশানী দূর করে দিন। এইরূপে প্রার্থনাকারী তার অন্যান্য এমনসব নেক আমলের কথা উল্লেখ করে সেগুলো উসীলায় প্রার্থনা করতে পারে, যে নেক আমলগুলো সে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করেছে। যেমন, আল্লাহর প্রতি ঈমান, সালাত, সাওম, জিহাদ, তিলাওয়াতে কুরআন, যিকির, নবী (ﷺ) প্রতি দুরূদ, ইস্তেগফার, এইরূপে অন্য যে কোনো নেক আমল ও গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার কথাই উসীলা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলা বলেন, “যারা বলে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদের অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের ‘আযাব থেকে রক্ষা করুন”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬] হাদিসে বর্ণিত আছে, “তিন ব্যক্তি একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলো; কিন্তু ঘটনাক্রমে একখণ্ড পাথর গড়িয়ে এসে তাদের গুহামুখ বন্ধ করে দেয়। ফলে সেখান থেকে মুক্তির আর কোনো উপায় না দেখে, তারা তিনজনই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী নিজেদের সর্বোৎকৃষ্ট আমলের কথা উল্লেখ করে সে উসীলায় আল্লাহ তা‘আলার নিকট এই বিপদ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানায়। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাদের পেরেশানী দূর করেন ও বিপদ থেকে মুক্তি দেন”। [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

৩। কাফিরকে কাফির না বলা, শিরককারীদের অমুসলিম ও কাফের বলে বিশ্বাস না করা বা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের ধর্মমতকে সঠিক বলে মন্তব্য করাঃ প্রকৃত কাফির যাদেরকে মিল্লাতে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় না, কেননা তারা শাহাদাতাঈন উচ্চারণ করেনি। যেমন ইহুদি-খ্রিষ্টান, অগ্নিপুজক, হিন্দু এবং অনুরূপ যারা। আল্লাম আব্দুল্লাহ আব্বাতীন (রহ) বলেন, “সকল মুসলিমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন ওই ব্যক্তির কুফরীর উপর, যে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাফির বলে না অথবা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে আর আমরা নিশ্চিত যে তাদের অধিকাংশ জাহেল। [রিসালাতুল ইন্তিসর] ইসলামের দিকে সম্পৃক্তকার কাফির যে শাহাদাতাঈনের উচ্চারণ করে কিন্তু এমন কুফরী কাজ করে যা তাকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয়।

আল্লাহ তা’আলা বলেন; বল, হে কাফিরগণ। [সুরা কাফিরুনঃ ১] এই আয়াতে আল্লাহ তা’আলা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)কে বলেছেন মক্কার মূর্তিপূজারীদেরকে হে কাফির বলে সম্বোধন করতে। অর্থাৎ বুঝা গেল কাফির বলার শিক্ষা আল্লাহ

তা'আলাই দিয়েছেন। আর একারণেই মুহাম্মাদ (ﷺ) কে হাদীসে বলা হয়েছে "আর মুহাম্মাদ হলো মানুষের মধ্যে বিভাজনকারী"। [সহীহ বুখারীঃ ৬৭৮৪ (ইফা)]

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় কাফির শব্দটি কোন গালি নয় বরং তার অর্থ অস্বীকারকারী, অবাধ্য, গোপনকারী। মক্কার মূর্তিপূজারীরা যেহেতু আল্লাহ এবং তার রাসুলের (ﷺ) কথা অস্বীকার করেছিল, তাই তাদের কাফির বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। ঠিক মক্কার মূর্তিপুজারীদের মতো এখন যদি কেউ আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসুলের (ﷺ) যে কোন একটি কথাও অস্বীকার করে তাহলে সেও কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফের এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয় মু'মিন।" [সূরা তাগাবুন-৬৪: ২]

এই উসুল এর মুল ভিত্তি কথা বা কাজের মাধ্যমে কুফর এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় বরং একজন কাফির-মুশরিককে কাফির ঘোষণা না করার মাধ্যমে ওয়াহীর (আল-কোরআন এবং হাদিস) বিধান অস্বীকার কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন (তাকযীব) করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ বলেন, "কাফির ব্যতীত আর কেউ আমাদের নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেনা" [আনকাবুত ২৯: ৪৭], এবং "যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য (এই কুরানের) আসার পর তা অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?"। [আয-যুমার ৩৯: ৩২] "নিশ্চয়ই যারা আমার অবতীর্ণ দলিল ও হেদায়েতকে যা লোকদের জন্য আমি কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করার পরেও তা গোপন করে, আল্লাহ তাদের লানত করেন আর লানতকারীরাও তাদের লানত করে থাকে। [সুরা বাক্বারাহ: ১৫৯] এ আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যারা আল্লাহর কথাকে গোপন করে তাদের উপরে আল্লাহর লানত অর্থাৎ তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত। তাই, আল্লাহ যদি কোনো কর্মের কারণে কাউকে কাফির বলে থাকেন, আর আমরা যদি ঐ কৃতকর্মের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কাফির না বলে গোপন করে রাখি তাহলেতো আল্লাহর আয়াতকে গোপন করা হবে। আল্লাহর আয়াতকে গোপন করার কারণে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হবো। আর আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিরা জান্নাতে যেতে পারবে না। [সহীহ মুসলিম: ৬৮৫২, ৬৮৫৫, ৬৮৬১ (ইফা)]

কুরআন এবং হাদিসে কাফিরদের সাথে মুসলিমদের আচার-আচরণের নিয়মগুলি বর্ণিত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ মুমিন নারীগণ তাদের (কাফিরদের) জন্য বৈধ নয় এবং তারাও (কাফিররাও) তাদের (মুমিন নারীদের) জন্য বৈধ নয়। [সুরা মুমতাহিনা: ১০] এই আয়াতটি বলছে যে, কাফির মুসলিম নারীদেরকে বিবাহ করতে পারবে না। এই আয়াতটি পালন করা তখনই সম্ভব হবে যখন জানা যাবে কে কাফির। যদি আমরা না জানি যে, কি কি কারণে মানুষ কাফির হয় তাহলে এই আয়াতটির উপর আমল করবো কিভাবে? তাই কি কি কারণে মানুষ কাফির হয় তা আমাদের জানা খুবই প্রয়োজন। মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ হে নবী, কাফির ও মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। [সুরা তওবাহ: ৭৩] এই আয়াতটিও তখনই আমল করা সম্ভব হবে যখন জানা যাবে যে, কারা কাফির এবং মুনাফিক্ব। মহান আল্লাহ বলেনঃ নবী এবং মুমিনদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়। যখন তাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। [সুরা তওবাহ: ১১৩] এই আয়াতটি জীবনেও আমল করা সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জানা সম্ভব হবে কারা মুশরিক। তাই যে সব কারণে একজন মানুষ কাফির, মুশরিক এবং মুনাফিক্ব হয় তা আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে। তাই যে কাফিরকে তাকফির করা পরিত্যাগ করে

সে মূলতঃ সুস্পষ্ট ওয়াহীর বিধান অস্বীকার করে। ফলে তাকেই (কাফিরকে যে তাকফির করা পরিত্যাগ করে) তাকফির করা হয়।

শায়খুল ইসলাম মুজাদ্দিদ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল ওয়াহাব (রহ) বলেছেনঃ "আল্লাহর কসম, হে আমার ভাইয়েরা, দ্বীনের মূল ভিত্তি সমূহকে আপনারা মজবুত ভাবে আকড়ে ধরুন, এর শুরু এবং শেষকে। দ্বীন এর অর্থ বুঝুন, একে ভালোবাসুন, দ্বীনের পক্ষের লোকদেরকে ভালোবাসুন এবং তাদেরকে নিজের ভাই হিসেবে দেখুন যদিও তারা আপনার থেকে অনেক দূরে। তাগুতকে, তাগুতের সাহায্যকারীকে তাকফীর করুন, তাদের শত্রু হয়ে যান। ঐ সব লোকের সাথেও শত্রুতা করুন যারা তাদেরকে (ত্বগুত ও তার অনুসারী) ভালোবাসে, রক্ষা করে, তাদেরকে তাকফীর করে না, এবং যারা বলে 'তাদের কাজের জন্য আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত নই' অথবা 'তারা যেসব কাজ করে সে ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে কোন দায়িত্ব দেন নি'। এ রকম ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলছে এবং প্রতারণা করছে। কারণ আল্লাহ আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন এসব ত্বগুতের বিরুদ্ধে কাজ করতে। আল্লাহ আমাদের উপর ফরজ করেছেন তাগুত থেকে দূরে থাকতে, তাদেরকে তাকফীর করতে যদিও তারা আমাদের ভাই কিংবা সন্তান হয়"। [মাজমু আত্ তাওহীদ]

অন্যত্র তিনি বলেনঃ " ত্বগুতকে পরিত্যাগ করা অর্থ হলোঃ এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারো ইবাদাত হচ্ছে বাতিল, এবং নিজে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করা থেকে বিরত থাকা, আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয় তাদের সাথে শত্রুতা রাখা, এবং যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করে তাদেরকে তাকফীর করা এবং তাদের সাথে শত্রুতা রাখা"। [মাজমু ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল আজুবা]

তিনি আরো বলেছেনঃ দ্বীনের মূলনীতি দুটি।
প্রথমতঃ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের নির্দেশ দেয়া আর কোন শরীক নেই। এ বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত করা। এ নীতির ভিত্তিতেই মৈত্রী স্থাপন করা। এটির বর্জনকারীকে তাকফীর করা।
দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর ইবাদাতে শিরকের বিষয়ে ভয় প্রদর্শন করা। এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা। এ নীতির ভিত্তিতে শত্রুতা স্থাপন করা। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে তাকফীর করা"। [আদ দুরার আস সানিয়া: ২/২০৩]

শাইখ আব্দুর রহমান আলে শাইখ বলেছেনঃ "যদি বান্দাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ জানতো তবে সে বুঝতে পারতো যে, যে শিরক করে তাকে তাকফীর করার ব্যাপারে যে সন্দেহে থাকে কিংবা দ্বিধাগ্রস্থ থাকে, সে তাগুতকে পরিত্যাগ করে নি"। [আদ দুরার আস সানিয়া: ১১/৫২৩]

যারা কুফরী করে তাদের উপর কুফরের বিধান পতিত হয়, হোক তা অন্তরের বিশ্বাস বা বক্তব্য অথবা আমলের ক্ষেত্রে। তবে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফীর করা (কাউকে কাফির হিসেবে সাব্যস্ত করা) এবং অনন্তকাল জাহান্নামে থাকার বিষয়টি তাকফীরের শর্ত পূরণ এবং এর নিরোধক বিষয় সমুহের অনুপস্থিতির উপর নির্ভরশীল। যখন এমন কোন দালীল বর্ণনা করা হয় যা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দান করে বা শাস্তির হুমকি প্রদান করে, তাকফির বা তাফসিক

(কাউকে ফাসিক হিসেবে সাব্যস্থ করা) নির্ধারণ করে, তখন তা আমভাবে বর্ণনা করা হয়। আর এই আমভাবে বর্ণিত দালীলসমূহকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা যাবেনা যতক্ষণ না তার কাছে এই বিধান প্রয়োগের আবশ্যক বিষয়গুলো প্রকাশ পায়, যার ব্যাপারে কোন বিরোধিতা নেই। সন্দেহের ভিত্তিতে বা মানুষের কোন আমলের অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ফল বা কারও কোন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কুফরি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার ভিত্তিতে কাউকে তাকফীর করা যাবেনা। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসুল (ﷺ) তাকফীর করেছেন, যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করে তাদেরকে তাকফীর করতে হবে; কারন হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হোক আর না হোক এমন ব্যক্তি কাফির। কিন্তু আখিরাতে একমাত্র তারাই শাস্তি পাবে, যাদের নিকট হুজ্জাহ বা প্রমাণ পৌঁছেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার রব কোন জনপদ ধ্বংস করেন না রসূল না পাঠানো পর্যন্ত। [সূরা কাসাস: ৫৯] আল্লাহ কাউকে শাস্তি দেন না রসূল না পাঠানো পর্যন্ত। [সূরা বনী ইসরাঈল: ১৫] এটা এজন্য যে, তোমার রব কোন জনপদ ধ্বংস করেন না অন্যায় ভাবে, যখন তার অধিবাসীরা বে-খবর। [সূরা আন-আনআম: ১৩১] আমি কোন জনপদই ধ্বংস করিনি যার জন্যে সতর্ককারী ছিল না। [সূরা আশ-শুয়ারা: ২০৮]

তাকফীরের কিছু শর্তঃ

যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির আখ্যায়িত করবে না হয়ত সে তার অবস্থা জানে না ওই ব্যক্তির মত যে জানেনা যে, অমুক ব্যক্তি কুফরী কথা বলেছে অথবা কুফরী কাজ করেছে। তবে সে হলো ওজরগ্রস্থ ব্যক্তি। আর সে এই মূলনীতির মধ্যে পড়বে না। আর এটাকে বলা হয় অবস্থার অজ্ঞতা। অত:পর যদি সে তার অবস্থা জানতে পারে তাহলে সে তাকে ওই কাফির দৃষ্টিতে দেখে থাকে, কাফির মনে করা হয়নি অথবা তার কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তার মতবাদকে সঠিক মনে করে।

প্রকাশ্য ও গোপনীয় হওয়ার দিক থেকে এদের কুফরী কয়েক প্রকারে বিভক্ত হয়ে থাকে:

একঃ যার কুফরী প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট কুরআন এবং সুন্নাহে যার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে ওই সকল মুশরিকদের মত যারা গাইরুল্লাহকে আহব্বান করে এবং তাদের ইবাদত করে –এসকল লোকদের আমল তাওহীদের মূলকে বিনষ্টকারী এবং সকল দিক থেকে তাওহীদ বিরোধী। যে তাদেরকে কাফির বলবে না, সে দুটি অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারবে না। হয় সে মনে করবে তাদের কাজ সঠিক এবং তাদেরকে স্বীকৃতি দেবে, সে তাদের মতই কাফির। যদিও সে নিজে শিরক না করে কেননা সে শিরকী কাজকে সত্যায়ন করছে এবং স্বীকৃতি দিয়েছে। আর এটা কুফর, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

অথবা সে বলবে তাদের কাজ কুফর এবং শিরক কিন্তু তাদেরকে কাফির বলবে না এই ব্যাখ্যা দিয়ে যে, তারা জানেনা। এই শ্রেণীর লোকদেরকে কাফির বলা যাবে না কেননা তারা তাদের কাজকে সঠিক বলেনি এবং সত্যায়ন করেনি বরং তাদের অজ্ঞতার ওজর পেশ করেছে সুতরাং তারা যে সন্দেহ উপস্থাপন করেছে – এর কারণে তাদেরকে কাফির বলা যাবে না। আর যখন তাদের সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যাবে তাহলে তারা তাকফিরের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। আর যে ব্যক্তি তার ইসলামকে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাব্যস্ত করবে সে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত ইসলাম থেকে বের

হবে না। আর ব্যাখ্যা (তাদের ওজর হিসেবে) প্রথমেই তাকে কাফির কলতে বাধা দেয় যতক্ষণ না পর্যন্ত সুস্পষ্ট প্রমাণিত না হবে এবং সংশয় দূরীভূত না হবে। তারপরে যদি তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত না করে, তবে সে কুফরী করল।

আল্লামা সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বলেন, "কবর পুজারীদের কুফরীদের ব্যাপারে যারা সন্দেহ পোষণ করে অথবা নিরবতা পালন করে অথবা অজ্ঞতার কথা বলে তাদের ব্যাপারে অজ্ঞতা পেশ করে, যার ব্যাপারে কুরআন ও রাসূল (স) এর সুন্নাহ থেকে প্রমাণ রয়েছে তাহলে সে সকল আলেমদের ঐক্যমতে কাফির। কেননা যে কুফফারদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, সে কাফির"। [আওছাকু-উরাল-ঈমান জিননা-মাজমুআতুত তাওহীদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ১২০]

শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল লতীফ আলে শাইখ (রহ) বলেন, "যে ব্যক্তি ইবাদতের কিছু বিষয় বান্দার জন্য সাব্যস্ত করবে অথবা এই বিশ্বাস করবে যে, যে ব্যক্তি এর পাশে দাঁড়াবে তার জন্য হজ্ব করতে হবে না, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে কুফরী করেছে। আর যে এতে সন্দেহ পোষণ করবে তাকে অবশ্যই এই শিরক ও কুফরীর বিপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে যে এই পাথর গুলো আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সমতুল্য যার পাশে অবস্থান করা ইবাদত। যদি এর বিরুদ্ধে দলিল প্রমাণিত হয় এবং এর ওপর অটল থাকে তবে তার কুফরীতে কোন সন্দেহ নেই। [আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, ১০/৪৪৩]

দুইঃ কুফরীতে সম্ভবত সন্দেহের জন্য। আর তা ওই বিচারকদের মতো যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করে। যাদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্ট বা অকাট্য। কেননা সংশয়ের আগমন সম্ভাব্য। তাই তাদের যে কাফির বলবে না, তাদেরকে কাফির বলা যাবে না। যদি না তাদের বিরুদ্ধে দলিল প্রমাণিত না হয়; সংশয় স্পষ্ট ও দূরীভূত না হয় এবং জানা যায় যে, আল্লাহর বিধান তাদের নিকট রয়েছে; তবে সেটা কুফরী হবে।

তিনঃ তাদের কুফরী ইজতিহাদগত বিষয় হবে যাতে মুসলিমদের মতানৈক্য রয়েছে সলাত পরিত্যাগকারীর বিধানের মতো এবং অনুরূপ। নিশ্চয়ই এই মাসআলাটিতে কুফরী করা না দেখা গেলে, কাফির বলা যাবে না।

প্রচলিত আছে, "কেউ যদি ৯৯ টি কুফরী কাজ করে আর একটি এমন কাজ করে যা প্রমাণ করে যে সে মুসলমান, তাকে কাফের বলা যাবে না"। এর দ্বারা তারা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে যে, যারা সলাত আদায় করে, রোযা রাখে, কিন্তু মাজারে সিজদাহ্ করে, মৃত ব্যক্তির নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে আ'লিমুল গায়েব (সকল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী) বলে দাবি করে, তাদেরকে কাফের বলা যাবে না। এটি কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট খেলাফ, সাহাবায়ে-কেরাম, তাবেঈ-তাবেঈনের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা সকল সাহাবায়ে কেরামের ইজমা অনুযায়ী ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ ফতওয়া দেয়া হয়েছে, যারা ইসলামের সকল বিধান পালন করলেও শুধুমাত্র একটি পালনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যারা দাবি করেছে যাকাত রাসূলের সময় ছিল, এর হুকুম বর্তমানে বাকি নেই।

অনেকে বলে থাকেন, উপরোক্ত মতটি ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর, অথচ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ঐ ব্যক্তিদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছেন যারা আল্লাহ্‌র সকল বিধান মানতো, নামায পড়তো, রোযা রাখতো, হজ্জ করতো, যাকাত দিতো, কিন্তু শুধুমাত্র বলতো কুরআন মাখলুক (অর্থাৎ, কুরআন কে তৈরি করা হয়েছে – অথচ আল্লাহর 'কথা' এর ব্যাপারে এমন উক্তি সরাসরি কুফরী)। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন: ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন, আমি ইমাম আবূ হানীফার সাথে ছয় মাস বাহাস (পর্যালোচনা) করেছি, অতঃপর আমরা একমত পোষণ করেছি যে, যে ব্যক্তি বলবে কুরআন মাখলুক সে কাফের। [ইমাম বায়হাকী (রহঃ) সহীহ সনদে এই আছারটি উল্লেখ করেছেন, ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা-৪০ প্রকাশনা: ইদারাতুল কুরআন, করাচী] আহমদ বিন কাসেম বিন আতিয়্যাহ্‌ বলেন: ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ আমি ঐ ব্যক্তির পিছনে নামায পড়ি না যে বলে কুরআন মাখলুক। (কেউ পড়লে) তাকে পুনরায় পড়ার আদেশ দিয়ে ফতওয়া প্রদান করি। [ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা-৪০ প্রকাশনা: ইদারাতুল কুরআন, করাচী]

সুতরাং, উপরোক্ত মতটি যেভাবে বর্ণনা করা হয় তা আবূ হানীফা (রহঃ) এর মত হতে পারে না। আর যদি হয়েও থাকে, তার যে অর্থ নেয়া হয় সেটি সঠিক নয়। এর অর্থ হবে কেউ যদি একশটি কাজ করে, আর তার নিরান্নব্বইটি কাজই এমন যা অস্পষ্ট কুফরের উপস্থিতি প্রমাণ করে, কিন্তু একটি কাজ তাকে মুমিন হিসাবে সাব্যস্ত করে, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না। কেননা ইসলাম হল ইয়াক্বীনী বিষয় যা সংশয় দ্বারা দূরীভূত হয় না। আল্লামা কাশ্মীরী বর্ণনা করেছেন: ফতওয়ায়ে হিন্দিয়ার মধ্যে এসেছে, যদি কোনো মাসআলায় এমন একাধিক বিষয় থাকে যা কুফরকে সাব্যস্ত করে, কিন্তু একটি বিষয় বিরত রাখে তখন মুফতির জন্য আবশ্যক হল সে মতটিই গ্রহণ করা। কিন্তু সে যদি তার ইচ্ছা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে এবং তা কুফরকে সাব্যস্ত করে, তাহলে আর কোনো ব্যাখ্যাই কাজে আসবে না। [ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা-৫৯ প্রকাশনা: ইদারাতুল কুরআন, করাচী]

তাকফীর যদি ইচ্ছাকৃত ভুল না হয়ঃ

পর্যাপ্ত কারণ থাকার পর তাকফীর করলে এবং তাতে ভুল হলেও কোন গুনাহ হবে না। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বলেনঃ "মালিক বিন দাকসান (রাঃ) কে যে ব্যক্তি বলেছিলেনঃ 'তুমি একজন মুনাফিক এবং মুনাফিকদের পক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছো' – যদি কোন ব্যক্তি তার ইসলামের সাথে নিফাক কিংবা এ জাতীয় কাজ প্রকাশ করে এবং এর প্রমাণ থাকে তবে এর মাধ্যমে (ওই ব্যক্তিকে ভুলক্রমে তাকফীর করার কারণে) সে কাফির হবে না কিংবা গুনাহগারও হবে না। বরং ভুল ব্যাখ্যার কারণে তাকে ক্ষমা করা হবে"। [ফাতহুল বারী, কিতাবুস সালাত, ১/৫২৩]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেছেনঃ "যদি একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে ভুলক্রমে হত্যা করে কিংবা তাকফীর করে, তাহলে সে এর দ্বারা (এই ভুল করার কারণে) কাফির হয়ে যায় না। এটা ঐ রকম ব্যাপার যখন উমার (রাঃ) হাতিব বিন বালতায়া (রাঃ) সম্পর্কে বলেছিলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ), এই মুনাফিকের মস্তক উড়িয়ে দিতে আমাকে অনুমতি দিন'। রাসুল (ﷺ) উত্তর দিয়েছিলেনঃ 'সে তো বদরে অংশগ্রহণ করেছিলো। আর আল্লাহ বদরের অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে বলেছেনঃ 'তোমরা যা খুশী করতে থাকো কারণ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আর এই ঘটনা সহীহাইনে (বুখারী ও মুসলিমে) বর্ণিত আছে। [সহীহ বুখারী, ৩৬৯৪ (ইফা)]

এছাড়াও আল ইফকের বর্ণনায় রয়েছেঃ উসাইর ইবনে হুদাইর (রাঃ) সাদ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) কে বলেছিলেনঃ "আসলে তুমি একটা মুনাফিক এবং মুনাফিকদের পক্ষে কথা বলছো"। এরপর দুই দল (আওস ও খাজরাজ) বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হলো এবং রাসুল (ﷺ) উভয় দলের ভিতর মীট-মাট? করে দিলেন। [সহীহ বুখারী, সাক্ষ্য অধ্যায়, মাগাযী অধ্যায়, সহীহ মুসলিমঃ তাওবা অধ্যায়] এরা সবাই বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন এবং তাদের একজন বলেছিলেনঃ 'তুমি একজন মুনাফিক'। তারপরও রাসুল (সাঃ) তাকে (তাকফীরকারীকে) কিংবা অপরজনকে কাফির বলেন নি। বরং তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তারা সবাই জান্নাতের অধিবাসী হবেন"। [মাজমু আল ফাতওয়াঃ ৩/২৮৩-২৮৪]

হাতিব বিন বালতায়া (রা) কে তাকফীর করার কারণে রাসুল (ﷺ) উমর (রা) কে তাওবা করতে বলেন নি, তিরস্কারও করেন নি। এটি যদি কোন ছোট গুনাহ হতো, তবে অন্তত উমার (রা) কে তিনি তিরস্কার করতেন। বরং রাসুল (ﷺ) হাতিব (রা) এর পক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন। কিন্তু তাকফীরের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। কারন হাতিব (রা) এর কাছ থেকে কুফরী প্রকাশ পেয়েছিল। উমার (রা) এর তাকফীর বাহ্যিকভাবে ঠিকই ছিল, কিন্তু অন্তরের বিষয়ে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে আলাদাভাবে জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আর ওহীর মাধ্যমে কোন কুফরী কাজ করার পর মনের অবস্থা জানার সুযোগ নেই। তাই বর্তমানে কুফরী দেখার পর একথা বলার সুযোগ নেই, 'আমরা তার অন্তরের খবর জানি না'। একথা উমার (রা) নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যামানায় কিছু লোককে ওয়াহীর ভিত্তিতে পাকড়াও করা হত। এখন যেহেতু ওয়াহী বন্ধ হয়ে গেছে, সেহেতু এখন আমাদের সামনে তোমাদের যে ধরনের আমল প্রকাশ পাবে, সেগুলোর ভিত্তিতেই আমরা তোমাদের বিচার করবো"। [সহীহ বুখারীঃ ২৪৬৫ (ইফা)] অনেক সাহাবীদের সামনে এই কথা বলায় এটা সাহাবীদের ইজমা হিসেবে গণ্য হবে।

শাইখ আব্দুর রহমান বিন হাসান (রঃ) বলেছেনঃ "কোন ব্যক্তি যদি আল-কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে, আল্লাহর জন্য গাইরাহ (আত্মসম্মানবোধের) এর কারণে এবং আল্লাহ যা ঘৃণা করেন তা ঘৃণা করার কারণে অন্যকে এমন কোন কাজের কারনে তাকফীর করে, যে কাজকে আলিমরা কুফর বলেছেন, তাহলে তাকে একথা বলা উচিত হবে না (যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে তাকফীর করে সে কাফির হয়ে যায়)। [আদ দুরার আস সানিয়া, জিহাদ অধ্যায়, পৃঃ ১৩২]

রাসুল (ﷺ) কে আবু যার (রাঃ) বলতে শুনেছেনঃ "কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে যদি ফাসিকী কিংবা কুফরের তোহমত দেয় কিন্তু তা ঐ ব্যক্তির মধ্যে না থাকে, তবে এটা তার দিকে ফিরে আসবে"। [সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদাব] আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুল (ﷺ) বলেছেনঃ 'যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে সম্বোধন করে, তবে সেটা তাদের যে কোন একজনের উপর বর্তাবে"। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "যদি তার কথা ঠিক হয় (ঐ ব্যক্তি কাফির হয়, তাহলে তো হলো) আর তা না হলে এটা তার দিকে ফিরে আসবে"। [সহীহ বুখারীঃ ৫৬৭৪, ৫৫৬১ (ইফা)]

হাফিজ ইবনে হাজার (রহ) এই হাদিসের ব্যাখায় বলেছেন; আর সঠিক কথা হচ্ছে এই হাদিসটি একজন মুসলিমকে তার ভাইকে এরকম কথা বলা থেকে আটকিয়ে রাখে, এবং যা এরকম কথা খারেজী এবং অন্যান্য দলগুলো বলতো।

এবং বলা হয় এর অর্থ হচ্ছেঃ যা তার দিকে ফিরে আসে সেটা হচ্ছে ঐ তোহমত এবং তাকফীরের গুনাহ। এই ব্যাখ্যা ঠিক আছে। এবং এটা বলা হয় যে, ভয় হয় যে এটা তাকে কুফরীর দিকে নিয়ে যাবে। ঠিক যেভাবে বলা হয়ঃ গুনাহ সমূহ মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। তাই ভয় করা হয়, সে যদি ঐ গুনাহ বারবার করতে থাকে, তাহলে সে একটা খারাপ পরিণতির দিকে চলে যাবে।

আর এই হাদিসের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছেঃ এটা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে এমন কাউকে তাকফীর করে যার মধ্যে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু দেখা যায় নি এবং তাকে তাকফীর করার মতো এমন কোন কারণ উপস্থিত নেই যা থাকলে আসলেই সে কাফিরে পরিণত হতো। তাই এই হাদিসের অর্থ হচ্ছেঃ এই তাকফীরটি তার দিকে ফিরে আসবে। অর্থাৎ তাকফীরটি তার দিকে ফিরে আসবে কিন্তু কুফর নয়। এটা হচ্ছে নিজের জন্য কুফর উচ্চারণ করার মতো কারণ সে যাকে তাকফীর করছে, সে তো তারই মতো (একজন মুসলিম ভাই)”। [ফাতহুল বারীঃ ১০/৪৬৬]

এমন কাউকে কাফির আখ্যায়িত করা, যার মধ্যে কেউ কুফরী প্রত্যক্ষ করেছে; কিন্তু বাস্তবে সে কুফরী করেনি। যেমন; কেউ কুরআনকে ছুড়ে ফেলে দিল (যা কুফরী)। অন্য কেউ তা দেখে তাকে কাফির আখ্যায়িত করল। কিন্তু যে ছুড়ে ফেলেছে, সে মনে করেছে তা নাস্তিক হুমায়ুন আহমেদের বই। ফলে এখানে কেউই কাফির নয়। ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (রহ) বলেন, “কেউ যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে তাকফীর করে, নিজের আনন্দের জন্য কিংবা মনের খেয়াল-খুশীর জন্য নয় বরং সে তাকফীর করে এবং অন্য কাউকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করে কারো উপর আল্লাহ, তাঁর রাসুল (সাঃ) এ দ্বীনের কারণে রাগ হয়ে, সে এ কারণে কুফরীতে পতিত হয় না। এমন কি এই কারণে তার গুনাহ হবে না, তাকে এ কারণে জবাব্দিহী করতে হবে না। বরং তার ইচ্ছা ও নিয়্যতের কারণে সে সওয়াবের অংশীদার হবে। কিন্তু যদি পরিস্থিতি ভিন্ন হয় যে কেউ নফসের কারণে কিংবা বিদয়াতীদের মতো তা করে তবে আলাদা কথা। তারা নিজের ইচ্ছা মতো এবং অন্য মাজহাবের বিরোধিতায় অন্যদেরকে বিদয়াতী বলে কিংবা তাকফীর করে। বরং তারা নিজেরাই সেই উপাধির যোগ্য যা তারা অন্যদেরকে দিতে চায়”। [যাদুল মা'আদ]

৪। নবী (স) এর আনীত ত্বরীকার চেয়ে অন্য ত্বরীকা কে পরিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করা অথবা নবীর আনীত বিধান থেকে অন্য বিধানই উত্তম বলে মনে করা। এরূপ আকীদা পোষন কারী ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে কাফের বলে বিবেচিত। যেমন কোন ব্যক্তি তাঁর আনীত বিধানের উপর বিধানকে অগ্রাধিকার দিল, এবং কোরআন হাদীসের সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে বৈধ জ্ঞান করে মানব রচিত বিধানে বিচার শাসন করল: আল্লাহ বলেন, তারা কি জাহিলিয়্যাতের শাসন-ব্যবস্থা কামনা করে? দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আইন প্রণেতা হিসেবে আল্লাহর চাইতে উত্তম কে আছে? [সূরা মায়েদা: ৫০]

যারা সেক্যুলার রাজনীতি, গণতন্ত্র, কমিউনিজম, সোশালিজম, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি মতাদর্শের পিছে দৌড়ায় এবং এই মতাদর্শগুলোর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে, তারাও মূলতঃ তাদেরই বন্ধু যাদের শরণাপন্ন তারা হয়েছে। [আর রিদ্দাহ বাইনা আল-আমস ওয়াল ইয়াওম] যারা ইসলামের পবিত্রভূমি থেকে কাফিরদের ভুমিতে পলায়ন করে, তাদের চিন্তাধারা-ধ্যানধারণার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে, তারা মূলতঃ তাদেরই বন্ধু যাদের কাছে তারা গিয়েছে। [আর রিদ্দাহ বাইনা আল-আমস ওয়াল ইয়াওম]

মানবরচিত গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী সংসদে অংশগ্রহণ করা, ভোট দেওয়া, যেখানে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা হয়না, এমনকি এসব মতবাদে বিশ্বাসীদেরকে সমর্থন করাও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এর দ্বারা সে আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারীদের সমর্থন করল। আল্লামা সা'আদী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে মুনাফিকদের অবস্থা বলে বিস্মিত করছেন। "যারা দাবী করে যে তারা" রসূল (ﷺ) এর উপর এবং তাঁর পূর্বে যা কিছু অবর্তীণ হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, ইহা সত্ত্বেও তারা তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ " "করছে, অথচ "তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যাতে তারা তাকে অস্বীকার করে"। তাহলে ঈমান ও তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা কিভাবে একত্রিত হতে পারে?! কেন না ঈমানের দাবী হলো: সকল বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার শরীয়াতের আনুগত্য স্বীকার ও তাকেই ফায়সালাকারী নির্ধারণ। সুতরাং যে ব্যক্তি দাবী করবে সে মুমিন আর আল্লাহ তায়ালার বিধানের বিপরীত তাগূতের বিধানকে নির্বাচন করবে সে নিজ দাবীতে মিথ্যাবাদী। আর এটি হবে শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলছেন, শয়তান ইচ্ছা করছে তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করে " "ফেলতে হক্ব থেকে। [তাফসীরে সা'আদী, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:১৮৪] ইবনে আব্দিল বার (রহ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকে ও তা প্রত্যাখ্যান করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যায়, যদিও সে এ বিধানকে স্বীকার করে। ইসহাক বিন রাহওয়াইহ বলেন: সকল আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ কোন একটি বিধানকেও প্রত্যাখ্যান করে সে নিশ্চিতভাবে কাফের হয়ে যায়, যদিও সে সেটাকে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান বলে স্বীকার করে। [তামহীদ: ৪/২২৬]

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার করা কখনো কখনো কুফরে আকবর হয় যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এবং কখনো কুফরে আসগর হয় যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না। আল্লাহর বিধান ব্যতীত বিচারকারী নিম্নলিখিত অবস্থা থেকে মুক্ত নয়:

(১) মূলত আল্লাহর বিধান ধারনকারী কিন্তু কোন একটি সমস্যা অথবা অনুরূপ বিষয়ে যেমন; ঘুষ, নিজ প্রবৃত্তি বা অন্যকোন কারণে আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করে।

(২) নিজেই কিছু আইন প্রণয়ন করা এবং তা দিয়ে স্বেচ্ছায় বিচার ফয়সালা করা।

(৩) অন্যান্য সংবিধান থেকে আইন গ্রহণ করা এবং স্বেচ্ছায় তা দিয়ে বিচার ফয়সালা করা।

(৪) পূর্ববর্তী বিচারকের নিয়ম-কানুন দ্বারা স্বেচ্ছায় বিচার ফয়সালা করা।

(৫) আল্লাহর শরিআহর বিরোধী আইন দ্বারা বাধ্য হয়ে বিচার ফয়সালা করা।

(৬) অজ্ঞতার কারণে আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা না করা।

(প্রথম অবস্থা) যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করেঃ কোন সমস্যা ও অনুরূপ বিষয়ের কারণে ফয়সালা করে এটা জানার এবং স্বীকার করার পাশাপাশি যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা করা আবশ্যক। এটা জেনেও ঘুষ পাওয়ার কারণে অথবা নিজ প্রবৃত্তির কারণে শরিআহর বিধান পরিত্যাগ করে, তবে সে পাপী। কিন্তু শরিআহর হুকুমের পরিবর্তে অন্য কোন বিপরীত হুকুম জারী করে না। সুতরাং তার কুফরীটা হবে ছোট কুফর যা তাকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেবে না। আর এর উপরই ইবনে আব্বাস (রা) এর উক্তি প্রমাণ করে। কেননা তিনি বনূ উমাইয়্যার শাসন আমলে অনুরূপ বলে ছিলেন। আর তারা শরীয়তের বিধান

দিয়েই বিচার ফয়সালা করত কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিচারের ক্ষেত্রে যুলুম করত। কিন্তু তারা আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান রচনা করেনি যা মানুষদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছিল। সুতরাং রচিত বিধান প্রণিত হয়েছিল কেবলমাত্র তাঁতারীদের যুগে।

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল শাইখ (রহ) বলেন, "অত:পর, দ্বিতীয় প্রকার হলো যে বিচারক আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করে না, তা হলো কুফরের দ্বিতীয় প্রকার। যা তাকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না। যার তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়, "যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।" [আল-মায়িদা ৫: ৪৪] আর এটা উপরোক্ত প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। উল্লেখিত আয়াতের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে; "কুফর দূনা কুফর।" অর্থাৎ এটা এমন কুফর, যা বড় কুফর নয়। অনুরূপ তার আরেকটি কথা, "তোমরা যে কুফরের দিকে যাচ্ছো তা সেই কুফর নয়"। আর এটা এজন্য যে, সেই বিচারক তার প্রবৃত্তি ও খেয়াল খুশির অনুসরণ করার কারণে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করে তার এই বিশ্বাস সত্ত্বেও যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানই মূলত এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার যোগ্য এবং এর পাশাপাশি সে এটাও জানে যে, সে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হিদায়েত থেকে দূরে। [আদ দুরার আস সানিয়া, ১৬ খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৮] তিনি আরও বলেন, এ ব্যপারে বলা হয় যে, এটা ছোট কুফর যখন আল্লাহর বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালা করে এই বিশ্বাস সত্ত্বেও যে, সে পাপী এবং আল্লাহর বিধানই যথার্থ। আর এটা তার পক্ষ থেকে একবার বা অনুরূপ সংখ্যক বার প্রকাশিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত বা ধারাবাহিকভাবে এটা করে, তবে সে কাফির। যদিও তারা বলে যে, আমরা ভুল করছি বা শরিয়াহর বিধানই অধিক ন্যায়নিষ্ঠ, যুক্তিযুক্ত। [ফাতওয়া মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম, ১২ খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৭০] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) বলেন, "আল্লাহর বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালা করা বিচারকের অবস্থার অনুপাতে ছোট বড় দুই ধরনের কুফরীই বহন করে। প্রকৃত বিচারক যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করা আবশ্যক কিন্তু সে করে না, তাহলে সে শাস্তির যোগ্য, তবে তা ছোট কুফর"। [মাদারিজুস সালেহীনঃ ১/৩৩৬]

শাইখ ইবনু ইবরাহীমের কথায় লক্ষণীয় বিষয়, "একবার বা অনুরূপ" এবং ইবনুল কায়্যিমের উক্তিতে লক্ষণীয় "প্রকৃতই"। সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে, যদি বিচারক আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিচার দানে অটল এবং অবিচল থাকে তাহলে সে এই প্রকারের অর্থাৎ ছোট কুফরের আওতাভূক্ত হবে না বরং সে বড় কুফরের আওতাভূক্ত হবে।

(দ্বিতীয় অবস্থা) আর তা হলো নিজে থেকে আইন তৈরী করা এবং স্বেচ্ছায় তা দ্বারা ফয়সালা করাঃ এটার ব্যাপারে হুকুম হলো, এটা কুফরে আকবর, যা তাকে মুসলিম মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়। আর এটা এজন্য যে, সে নিজের পক্ষ থেকে আইন রচনা করছে এবং এটা এজন্য যে, এ বিষয়ে আল্লাহ বিধান ও ফয়সালার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এতদ্বসত্ত্বেও সে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করেছে এবং মানুষকে তারটা মানতে বাধ্য করেছে। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে সে-ও শরিআহ প্রণয়ন করেছে এবং আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শরীক করেছে। আর সে তার সংকীর্ণ ও ভ্রান্ত মতামতকে আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমতুল্য গণ্য করেছে। আর এটা সবচেয়ে বড় (ঈমান) ভঙ্গকারী বিষয়। লা ইলাহা ইল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্যের বিপরীত।

(তৃতীয় অবস্থা) অন্য কোন সংবিধান হতে আইন গ্রহণ করে স্বেচ্ছায় তা দিয়ে বিচার করাঃ এর ব্যাপারেও হুকুম হলো, এটা কুফরে আকবর। কেননা সে অন্য আইন দ্বারা আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন করেছে এবং অন্য বিধানকে অগ্রাধিকার দিয়ে আল্লাহর বিধানকে প্রতিহত করেছে। সুতরাং এতে কোন পার্থক্য নেই যে এই আইন নিজে তৈরি করুক অথবা রহিত কোন গ্রন্থ থেকে অথবা অন্য কোন সংবিধান থেকে গ্রহণ করুক, প্রত্যেকটিই হবে শিরক। কেননা সে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে অন্য বিধানকে তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং মানুষের মাঝে বাস্তবায়ন করেছে।

(চতুর্থ অবস্থা) যে পূর্ববর্তী বিচারকের আইন দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে বিচার করেঃ এর ব্যাপারেও বিধান হলো, এটা কুফরে আকবর। কেননা আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান প্রবর্তন করলেই কুফর হবে, তা তার নিজের রচিত হোক অথবা অন্য কারো হোক।

(পঞ্চম অবস্থা) বাধ্য অবস্থায় আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে বিচার করাঃ আল্লাহর বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালাকারী যদি দাবী করে যে, সে বাধ্য তাহলে নিম্নলিখিত কারণে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

(১) কেননা তার জন্য আবশ্যক নয় যে, সে মুসলিমদের বিচারক হবে। বরং তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে সে বিচারকের পদ পরিত্যাগ করবে। আর যদি সে মনে করে যে, সে বাধ্য বিচারকের পদ গ্রহণ করতে, তবে সে এই বৃহৎ কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার চাইতে নিহত হওয়াকে অগ্রাধিকার দিবে। কেননা তার নিহত হওয়ার ক্ষতির তুলনায় আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে মানুষের মাঝে ফয়সালা বিধানের অধীন করা বেশি মারাত্মক। তার নিহত হওয়ার মাঝেই ক্ষতিটি সীমাবদ্ধ কিন্তু গাইরুল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করার ক্ষতি আরও ব্যাপক। শাইখ শায়খ সুলাইমান বিন সাহমান (রহ) বলেন, "যদি সকল শহরবাসী এবং গ্রামবাসীকেও হত্যা করাটা নিশ্চিত হয়। তবে একজন তাগুতকে যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার চাইতে সহজ হবে, যে ইসলামের শারী'আহর বিপরীতে বিধান দেয়। যার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলদের পাঠিয়েছেন"।

(২) যে তার কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা হারিয়েছে, তবুও তার অন্য কারও বিধান দিয়ে ফয়সালা করা বৈধ হবে না, যদিও সে নিজে বিধান প্রণয়ন না করে।

(৩) আল্লাহর শারী'আহ ব্যতীত অন্যের বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করা মানুষদের কুফরীতে পতিত করার মাধ্যম, আর মানুষ যদি শরিআহ বিরোধী বিধানে সন্তুষ্ট থাকে এবং তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যায় তাহলে তারা কুফরীতে পতিত হবে। দ্বীনের ভিতরে এমন ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যা করা অপেক্ষা বেশি মারাত্মক।

(৪) শারীআহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা ইবাদত এবং শরিআহর কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়াও ইবাদত। সুতরাং মানুষকে গাইরুল্লাহর ইবাদতের জন্য এবং তার কাছে নতি স্বীকার করতে ও মেনে নিতে বাধ্য করা যাবে না।

(ষষ্ঠ অবস্থা) অজ্ঞতাবশত আল্লাহর শরিআহ বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা না করাঃ এই হুকুমটি আরোপের পূর্বে অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে যে, অজ্ঞতা তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক সমূহের অন্যতম একটি প্রতিবন্ধক। কিন্তু এটি ব্যাপকভাবে নয়। কেননা অজ্ঞতা ওই ব্যক্তির জন্য যেমন- যে ইলম ও আমল থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করে অথবা নতুন মুসলিম এবং সে জানে না কিসে কুফর হয়। অন্যাথায় যদি সে মূর্খতা দূর করতে সক্ষম হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে সে নিশ্চুপ থাকে, তবে সে ওজরগ্রস্থ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে না। যারা অজ্ঞতার অজুহাত দেয়, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ) সেই তর্কবিদদের প্রতিবাদে বলেন, "আল্লাহ তা'আলার দলীল তাঁর রাসূলদের (আ) মাধ্যমে জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং যারা জ্ঞানের শর্তারোপ করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলীল তাদের নেই। আর এজন্যই কাফিরদের কুরআন শুনা থেকে বিমুখতা ও তা গবেষণা থেকে বিরত থাকার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দলীল প্রতিষ্ঠিত করার কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। অনুরূপভাবে যখন কুফরী পাওয়া যায়, তখন নবী (আ) দের কথা ও তাদের জীবনী পাঠ থেকে বিমুখতা, অজ্ঞতা তাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠিত করতে বাধা দেয় না।" [মাজমাউল-ফাতওয়া: খন্ড ১, পৃষ্ঠা: ১১২-১১৩]

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শাইখ ,বলেন (রহঃ) যদি বিধান প্রণয়নকারী বলে আমি বিশ্বাস রাখি এটা বাতিলযোগ্য, তার এ কথা ধর্তব্য হবে না। তার এই কাজ হবে শরীয়াতকে প্রত্যাখ্যান, তার কথাটি হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে মূর্তি পূজা করে, আর বলে আমি বিশ্বাস করি এটা বাতিল। আর যখন সে ধারাবাহিকভাবে একনিষ্ঠতার সাথে আইন প্রণয়ন করবে তখন সে কাফের হয়ে যাবে যদিও সে বলে, আমি (এই কাজটি) ভুল করছি আর শরীয়াতের বিধানই অধিক ইনসাফপূর্ণ। [আল-ফাতাওয়া, খন্ড: ১২, পৃষ্ঠা: ২৮০] সালামাহ ইবনু ছখর (রা) জানতেন, রমযানের দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস হারাম কিন্তু তিনি এটা জানতেন না যে, এর জন্য কাফফারা আবশ্যক হয়। যখন তিনি তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন তখন রাসূল (ﷺ) এর নিকট এলেন এবং জানালেন, তখন রাসূল (ﷺ) তার জন্য কাফফারাকে আবশ্যক করে দিলেন। তার না জানার কারণে ছেড়ে দেননি। [আবু দাউদঃ ২২১০ (ইফা), তিরমিযীঃ ১২০৩ (ইফা), ইবনে মাজাহঃ ২০৬২ (ইফা)]

৫। রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রদর্শিত কোন বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যদিও উক্ত বিধানের উপর আমল করা হয়। যদি কোন মুসলিম এরূপ করে তাহলে সে শরীয়তের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাফের বলে বিবেচিত হবে: কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: "এটি এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্মসমূহকে নিষ্ফল করে দেবেন"। [সূরা-মুহাম্মাদ ৪৭: ০৯] ইসহাক ইবনে রাওয়াবেহ (রহ) বলেন, "সকল মুসলমানরা একমত পোষণ করেছে; যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে গালি দিবে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে মন্দ বলবে অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ কোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে বা আল্লাহর কোন নবীকে হত্যা করবে নিশ্চয় সে কাফের। এই তার বিধান, যদিও বা সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানাবলীকে স্বীকার করে। [ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা-১১৯/১২০ প্রকাশনা: ইদারাতুল কুরআন, করাচী]

৬। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত কোন সামান্য বিষয় অথবা এর সওয়াব প্রতিদান বা শাস্তির বিধানের প্রতি কোনরূপ ঠাট্টা বিদ্রুপ করা কুফরী: কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: "তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, তারা বলবে,

‘আমরা তো একটু অযথা কথাবার্তা ও হাসি কৌতুক করছিলাম মাত্র’, তুমি বলো (তাদেরকে), ‘তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রুপ করছিলে? ‘তোমরা দোষ ছড়ানোর চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা পূণরায় কাফির হয়ে গিয়েছিলে”। [সূরা তাওবা ৯: ৬৫-৬৬] এটা হতে পারে আল্লাহ তা’আলা, রাসুল (ﷺ) কে নিয়ে, শরীয়তের যেকোনো বিষয় নিয়ে, যেমনঃ চোর, যিনার শাস্তি, দাড়ি, টুপি, মিসওয়াক ইত্যাদি নিয়ে ঠাট্টা, তুচ্ছ, তাচ্ছিল্য করার মাধ্যমে।

৭। যাদু করা ও যাদুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া; সুতরাং যে যাদু করল অথবা যাদুর প্রতি সন্তুষ্ট থাকল সে কুফরী করলঃ কেননা আল্লাহ তাআল বলেন: “অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত।” [সূরা জিন: ৬] “তারা অবশ্যই অবগত আছে, যে ব্যক্তি তা (যাদু) ক্রয় করে নিয়েছে, পরকালে তার কোন সুফল পাওনা নেই”। [সূরা বাকারা ২: ১০২] “তারা ‘জিবত’ এবং ‘তাগুত’ কে বিশ্বাস করে”। [নিসাঃ ৫১] ওমর (রা) বলেন, ‘জিবত’ হচ্ছে যাদু, আর ‘তাগুত’ হচ্ছে শয়তান। [ত্বাবারানীঃ ৫৮৩৪] জাবির (রা) বলেন, ‘তাগুত’ হচ্ছে গণক। তাদের উপর শয়তান অবতীর্ণ হতো। আর সাধারণত প্রত্যেক গোত্রের জন্যই একজন করে গণক নির্ধারিত ছিল। [ইবনে আবী হাতিমঃ ২/২২; সহীহ বুখারী, ৮/৩১৭] ইমাম বাগাবী (রহ) বলেন, গণক ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তি চুরি যাওয়া এবং হারিয়ে যাওয়া জিনিসের স্থান ইত্যাদি বিষয়ে অবগত আছে বলে দাবী করে, ভবিষ্যতের গোপন খবর জানার দাবী করে। [তাফসীরে বাগাবী]

রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক। আর তা হল আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থির করা ও যাদু করা”। [সহীহ বুখারীঃ ৫৩৫২ (ইফা)] “(শারীয়াহ বহির্ভূত) ঝাড়ফুঁক, তাবিজ ও অবৈধ প্রেম ঘটানোর মন্ত্র হচ্ছে শিরক। [আবু দাউদঃ ৩৮৪৩ (ইফা), মুসনাদে আহমাদ]

৮। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাবত: অমুসলিম তথা ইহুদী, খ্রিস্টান, কাফিরদের সাহায্য করাঃ কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে, নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না”। [সূরা-আল মায়িদাহ ৫: ৫১] আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা যারা করেনা, যারা আল্লাহর আউলিয়াদের সাথে যুদ্ধ করে, শত্রুতা পোষণ করে, তাদের সাহায্য করা, নিরাপত্তা দেওয়া (যেমনঃ তথা কথিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পুলিশ, বি.জি.বি, সেনবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী ইত্যাদি এরা করে থাকে) কুফরী। আল্লাহ তা’আলা বলেন; “এবং কখনই মু’মিনদের বিরূদ্ধে কাফিরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।” [সূরা নিসা ৪: ১৪১]

৯। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, কিছু লোক আছেন যাদের জন্যে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর শরীয়ত থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি আছে। এরূপ বিশ্বাস পোষন কারী ব্যক্তি শরীয়তের বিবেচনায় কাফের বলে বিবেচিত হবে: কেননা, কোন নবী, রাসুল (ﷺ), সাহাবীগণ (রা) হতে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। ইসলামে কুরআন এবং সুন্নাহর বাহিরে কোন দালিল নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন: “কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন বা ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত”। [সূরা-আল ইমরান ৩: ৮৫] মাজার, কবর ও পীর

পুজারী, সুফীরা বিশ্বাস করে, মানুষ ইবাদাত করতে করতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায়, ফলে তার আর ইবাদাত করা লাগেনা, তার জন্য শারীয়াহ দরকার নেই। (আল্লাহর কাছে পানাহ চাই)।

১০। আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ইসলামকে উপেক্ষা করে চলা। এর বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও সে অনুযায়ী আমল না করাঃ কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: "যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি"। [সূরা-আস সিজদাহ ৩২: ২২] প্রথমত, বান্দার জন্য আবশ্যক হলো তার রব আল্লাহ তা'আলাকে জানা, যেমনভাবে তিনি তাঁর কিতাবে ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর হাদীসে নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছেন; তাঁর একত্ববাদীতায়, নাম সমূহে, গুণাবলীতে ও তাঁর কার্যে তিনি সকল কিছুর রব ও অধিপতি। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ ও রব নেই। দ্বিতীয়ত, তাঁর দ্বীনকে জানা, অর্থাৎ দ্বীন-আল ইসলাম। যার দ্বারা আমরা আল্লাহর ইবাদত করি। তৃতীয়ত, তাঁর নবী মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কে জানা। কেননা রিসালাত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ও আমাদের মাঝে তিনিই একমাত্র মাধ্যম। আর তিনিই সৃষ্টির সেরা, তাঁর সম্মান ও মর্যাদায় অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

উল্লেখিত ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় সমূহে স্বেচ্ছায় জড়িত হওয়া আর ঠাট্টা-বিদ্রুপ কিংবা ভয়ভীতির কারণে জড়িত হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য কেহ জোরপূর্বক বাধ্য করলে কিংবা শরীয়ত যেসকল ক্ষেত্রে কুফরী প্রকাশ করার অনুমোদন দেয় তা হলে অন্য কথা। অতএব, বিষয়গুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং তার ঈমান নবায়ন করতে হবে। সুতরাং, প্রতিটি মুসলমানের উচিত ঈমান ও এর ঐচ্ছিক বিসয়সমুহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়গুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ পড়ে আমাদের হয়ত মনে হতে পারে, "তাহলে তো পৃথিবীতে প্রকৃত মুসলিমদের সংখ্যা অতি অল্প"। আর এটাই সত্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনার পরও মুশরিক"। [সূরা ইউসুফঃ ১০৬] "কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনেনা"। [আর রাদঃ ১] রাসুল (ﷺ) বলেন, "(কিয়ামতের দিন) মুশরিকদের মধ্যে তোমাদের অবস্থান হবে, যেমন কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশম অথবা লাল ষাড়ের গায়ে একটি কালো পশম। [সহীহ মুসলিমঃ ৪২৩ (ইফা)] "ওহে, অবশ্যই যারা তোমাদের পূর্বে ছিল তারা ৭২ দলে বিভক্ত ছিল এবং অবশ্যই আমার এই উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। ইহাদের সকল দলই দোযখে যাবে এক দল ব্যতিত। সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞেসা করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেটি কোন দল? নবী (ﷺ) বললেন, "আমি এবং আমার সাহাবীগণ যার উপর আছি, তার উপর যারা থাকবে।" [তিরমিজীঃ ২৬৪১ (ইফা) আবু দাউদঃ ৪৫২৬ (ইফা), ইবনে মাজাহঃ ৩৯৯২ (ইফা), মেশকাত শরীফ ১ম খন্ড, হাঃ ১৬৩]